বাঘ ও অজন্তা

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়



রত্নসাগর গ্রন্থমালা

প্রথম প্রকাশ
২৫শে বৈশাখ, ১৩৬২

প্রকাশক
দেবকুমার বসু
৭জে, পণ্ডিতিয়া রোড, কলকাতা-২৯

চিত্রকর্ম
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

বর্ণলিপি
চারু খাঁ

ব্লক
পি. সি. দাস
১১।১, হরিপাল লেন, কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ ও ছবি মুদ্রণ
ডি. সি. বোস এণ্ড কোং লিঃ
৬৫ বি, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলকাতা-১৩

মুদ্রাকর
কেশব প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৫, শান্তি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলকাতা-১

পরিবেশক
গ্রন্থজগৎ
৭জে, পণ্ডিতিয়া রোড, কলকাতা-২৯

—দেড় টাকা—

বাংলা ভাষার প্রসার ও সমৃদ্ধির জন্য বাংলা ভাষায় বহুবিধ পুস্তক প্রকাশ ও প্রচার প্রয়োজন। বহুবিধ বিষয়ে নানা পুস্তক ক্রমে-ক্রমে প্রকাশ করাই এই 'রত্নসাগর গ্রন্থমালা'র উদ্দেশ্য। সকলই রত্ন যাহা মন ও জীবনকে সারবান করে। গ্রন্থগুলি এই কাজে সাহায্য করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

সম্পাদক—দেবব্রত মুখোপাধ্যায়
সুশীল মজুমদার
মনোজ ভট্টাচার্য্য
দেবকুমার বসু

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

কুমার স্বামী
দি পেণ্টারস্ আর্ট ইন এনসেন্ট ইণ্ডিয়া
জে, আর, এস ও, এ, তে প্রকাশিত প্রবন্ধ ১৯৩৩
দি ডান্স অব শিব

স্যার রদেন ষ্টাইন
অজন্তা ফ্রেস্কো

ইয়াজদানী
অজন্তা

ভিত্তি অব ডেকান

প্রঃ ভোগেল
বুদ্ধিষ্ট আর্ট ইন ইণ্ডিয়া, সিলোন এণ্ড জাভা

হ্যাভেল
ইণ্ডিয়ান স্কালপ্‌চার এণ্ড পেন্টিং

পার্শী ব্রাউন
ইণ্ডিয়ান পেন্‌টিং

প্রঃ তুচি
টিবেটিয়ান পেন্‌টেড্‌স্ক্রোল

রোলাণ্ড
দি আর্ট এণ্ড আর্কিটেকচার অব ইণ্ডিয়া

ইণ্ডিয়ান সোসাইটি
বাঘ কেভ্‌স

গুরুদাস সরকার
মন্দিরের কথা

অসিতকুমার হালদার
অজন্তা
বাঘগুহা ও রামগড়

মুকুল দে
মাই পিলগ্রিমেজ টু অজন্তা এণ্ড বাঘ

অবনীন্দ্রনাথ
ভারত শিল্পের ষড়ঙ্গ
ভারত শিল্পে মূর্তি

নন্দলাল বসু
শিল্প কথা
শিল্পচর্চা

বিষ্ণুধর্মোত্তরম্
সমরাঙ্গন-সূত্রধার
কামসূত্র

যখন ছাত্র ছিলাম, শিল্পকর্মের প্রাণধর্ম বোঝার চেষ্টা করেছি।—কোনও উপায় খুঁজে পাই নি; কারণ, আমাদের শিল্প-শিক্ষালয়ে ব্যবহারিক শিক্ষার পরিপূরক কোন শিল্পশাস্ত্র অনুশীলনের ব্যবস্থা নেই। আজ যখন গুরুর আশীর্বাদে কিছু দেখা, শেখা ও আঁকার সুযোগ পেয়েছি তখন সেটা ছাত্র বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে ইচ্ছা করছে।

শিল্পশাস্ত্রের মূল কয়েকটি সূত্র—অজন্তা ও বাঘ ভিত্তি-চিত্রাবলীর উপর ব্যবহারিক প্রয়োগ করে দেখবার চেষ্টা করেছি। যদিও শিল্পশাস্ত্রের যে সব পুঁথি বর্তমানে পাওয়া গেছে এবং মনীষীরা সেগুলির যে সময় নির্ধারণ করেছেন তা' হয়তো অজন্তার কিছু গুহার অনেক পরবর্তী। তবু এ ধারণা করা অসঙ্গত হবে না যে সমসাময়িক প্রচলিত আদর্শ পরে এ পুঁথির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

ভারতীয় শিল্পধারার ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে ব্যাহত করার কুচেষ্টা আজ আবার দেখা দিয়েছে। ধনিকের অজ্ঞতা, জীবন-সংগ্রাম-ব্যস্ত মধ্যবিত্তের নিশ্চেষ্টতা ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে শিল্পের সংযোগহীনতা, বিশেষ করে অরসিকের হাতে শিল্প-বিচারের ভার পড়ায় ভারতীয় শিল্প-ধারা আজ আবার দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সম্মুখীন। সেই সংগে কয়েকটি বিদেশী পরিচালিত দৈনিক, উদ্দেশ্য প্রণোদিত আপ্রাণ চেষ্টায় ছাত্র বন্ধুদের [illegible] শিল্প দৃষ্টিকে অঙ্কুরেই বিপথগামী করতে সচেষ্ট।

এই দুঃসময়ে আমি আমার লেখার অক্ষমতা এবং জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থেকেও এই প্রচেষ্টা করেছি এই আশায়—যদি কোন রসিকজন বা জ্ঞানী জন এই বিষয়ে সচেষ্ট হন।

আমার এই লেখা দু'টী সংক্ষিপ্ত আকারে 'দেশ' পত্রিকার দু'টী শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং লেখাও হয়েছে বন্ধুবর শ্রীসাগরময় ঘোষের অনুরোধে।

গুরুদেব শ্রীভোলা চট্টোপাধ্যায় এবং অগ্রজ শ্রীবিনয় কৃষ্ণ দত্তের আশীর্বাদ ও 'টেকনিশিয়ান্‌স্ ষ্টুডিও'-এর প্রধান শ্রীঅজিত কুমার সেন এবং বন্ধুবর্গ শ্রীসত্যজ্ঞান চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরামানন্দ সেনগুপ্ত প্রভৃতির সহানুভূতি, বিশেষ করে শ্রীমান লাল মোহন দত্তের সহযোগিতায় আমার এ' ভ্রমণ সম্ভব হ'য়েছিল। আজ তাঁদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

—লেখক



"চিত্রকলাকে আধুনিক ভারত অনেকদিন থেকে অবজ্ঞা করে এসেচে। এ সম্বন্ধে আমাদের চিত্তের অসাড়তা এতদূর এগিয়েচে যে, আমরা যে কেবলমাত্র চিত্র সৃষ্টি করতে পারচিনে তা নয় প্রাচীন ভারতের চিত্র রচনারীতি আমরা বুঝতেই পারিনে, তাকে আমরা ব্যঙ্গ করতে ছাড়িনে। আমরা যখন স্বাদেশিকতার অভিমানে উন্মত্ত হয়ে উঠি তখনো এই কথাটি বুঝতে পারিনে যে, যে জাতি কলা বিদ্যায় আপন চিত্তের পরিচয় দেয়নি সে জাতি মহাপ্রাণ জাতি নয়। তাছাড়া একথা আমরা মনের দৈন্যবশতই ভুলেচি যে, একটুকরো কাগজে একটুখানি ছোট ছবি যদি সত্য করে আঁকতে পারি তার দ্বারা নিত্যকালের কাছে দেশের যে পরিচয় প্রকাশ হবে তা রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে খবরের কাগজের বড় বড় ধ্বজা আস্ফালন করেও হবে না।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উজ্জয়িনী থেকে 'বাঘ'এর পথে যাত্রা করলাম। তখন প্রায় সাতটা। সবে শীতের ভোরের আবছা আলো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। হোটেল থেকে ষ্টেশন খুব কাছেই। মালপত্র কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এখান থেকে 'মাণ্ড' প্রায় ৫৩ মাইল দূর—কিন্তু পৌঁছতে লাগলো তিন ঘণ্টা। 'মিটার গেজ' লাইন—ধীরে ধীরে চলাই এর স্বভাব।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে 'ধর-ট্রান্সপোর্ট'এর সুন্দর সুন্দর বাস, পাকা সুন্দর বাড়ি আর তার সঙ্গে ওয়েটিংরুম। আমাদের বাস যখন ছাড়লো তখন বেলা এগারোটা পেরিয়ে গেছে। মাণ্ড-এর থেকে ধর-এর সাদা মাটি রাস্তা ধরে প্রায় ৪৫ মাইল পৌঁছতে দুটো বেজে গেল। এখান থেকে ধর-কুক্‌সি বাস ধরে আমাকে আমার গন্তব্যস্থান 'বাঘ'-এ পৌঁছতে হবে। নির্ধারিত সময় তিনটে হলেও শুনলাম সাড়ে পাঁচটার আগে বাস ছাড়া সম্ভব হবে না। তা ছাড়া বাসের টিকিট পাওয়া এক নিতান্ত ভাগ্যের কথা। প্রায় দেড়শ লোক বুকিং অফিসের সামনে জমায়েত হয়েছে। টিকিট বাবুকে কাকুতি মিনতি করছে একটি করে টিকিট বিক্রয়ের জন্যে। ব্যাপার দেখে খুবই মুহ্যমান হয়ে পড়লাম। কি আর করি—অপেক্ষা যখন করতেই হবে—অগত্যা ধর বাস স্টাণ্ডএর ছবি আঁকতে বসলাম। ক্রমেই ভীড় জমে উঠলো পাশে। 'কলাকার' বলে সবাই বেশ উৎসাহী হয়ে পড়লো

আমার সঙ্গে আলাপ জমাবার জন্য। বিশেষ করে এইখানকার কয়েকটি কলেজীয় ছাত্র। তারাও বাসের টিকিটের প্রার্থী হিসেবে এখানে উপস্থিত।

তাদের কাছেই জানতে পারলাম—এখানেও একটি 'কলা বিদ্যালয়' আছে এবং 'কলাকার' সম্বন্ধে তাই এরা বেশ সজাগ। শেষ পর্যন্ত শ্রীমান কৃষ্ণরাও ঘোষে ও অন্যান্য ছাত্রদের অনুরোধেই বাসের টিকিট-বাবু নির্বিবাদে আমাকে একটি টিকিট দিয়ে দিলেন আর আমি বাকি প্রায় ৬০ মাইল বিন্ধ্যের নানা উত্থান পতনের সঙ্গে সমতালে সুন্দর পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে দিয়ে 'ঘাট' বা সঙ্কীর্ণ পাহাড়ে রাস্তা পার হতে লাগলাম। মাঝে বাস খারাপ হয়ে যাওয়ায় খানিকক্ষণ দেরি করে রাত প্রায় সাড়ে আটটায় পৌঁছালাম বাগ-এ।

এখানকার ডাকবাংলোর চৌকিদার যেন খানিকটা ক্ষুণ্ণ হলো আমার এই অসাময়িক উপস্থিতিতে। কারণ ডাকবাংলোয় কোন খাবার তৈরীর ব্যবস্থা নেই। কোন রকমে রাজী করিয়ে তাকে দোকানে পাঠালাম রাত্রের খাবার যোগাড়ে। পরোটা আর 'অমৃতের' তুল্য এক তরকারী যাকে ওরা বলে 'শাক'—তাই হলো আমার রাত্রের আহার। শাকের স্বাদ জীবনে ভুলবো না। এত ঝাল আর বিস্বাদ বস্তু এর আগে খাবার কখনো সৌভাগ্য হয়নি। কিন্তু সে রাত্রে আরামের ঘুম সেই বিস্বাদ তরকারির কথা ভুলিয়ে দিল। এবারে আমি আমার যাত্রার পূর্ণতা পাবো। তাই মহা আনন্দে অনেক আশা নিয়ে রওনা হলাম শিল্প-তীর্থ 'বাঘ' গুহার পথে। মাঝে ওই গুহার তত্ত্বাবধায়ক এবং গাইড পণ্ডিত মূলশঙ্কর শর্মার সঙ্গে দেখা করলাম এবং তাকে সঙ্গী করলাম।

পাঁচ মাইল 'পাকডণ্ডী' অর্থাৎ হাঁটাপথ পেরিয়ে আমাকে পৌঁছতে হবে আমার লক্ষ্যে—'বাঘ'-এ। বিন্ধ্যের চড়াই উৎরাই ও গভীর জঙ্গলের মধ্যে 'পাকডণ্ডী' থেকে থেকে লুকোচুরি খেলছে। আর আমি এবং শর্মাজী

এগিয়ে চলছি গভীর খাদের পাশ দিয়ে, ছোট পাহাড় ডিঙিয়ে, ঝর্ণার জল ভেঙে, ভীল, ভীলাড় বা মানকরদের হাঘরে মার্কা ঘর, ওদের ভাষায় 'টাপরী' ছড়ানো গ্রাম পেরিয়ে পৌছলাম 'বাঘ' রেস্ট হাউসে। ছোট্ট একটি ঘর আর তার সামনে তার চেয়েও ছোট এক ফালি বারান্দা। অল্প দূরে একটি ইঁদারা। শর্মাজী তাঁর নির্জনতা কাটাবার জন্য রেস্ট হাউসের সামনে ছোট একটি বাগান করবার জন্যে দুশ্চেষ্টা করেছেন। রাত্রে এখানে কেউ থাকে না। শর্মাজীও ফিরে যান তাঁর বাঘ গ্রামের বাসায়। আর তখন এখানে আস্তানা গাড়ে চোর বা ডাকাত। এবং তাদের নির্জনতার সঙ্গী হিসেবে অল্প দূরে ঘোরাঘুরি করে বাঘ এবং চিতাবাঘ।

কিছুক্ষণ পর শর্মাজীর সহকারী দুটি স্থানীয় ভীল এসে পৌছল। শর্মাজীর সঙ্গে আলাপ করে জানতে পারলাম,—শর্মাজীর মত অসাধারণ ভদ্র অথচ একজন সাধারণ গাইড আর তাঁর সহকারী এই ভীল দুটির উপরই মধ্যভারত সরকার 'বাঘ' গুহার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প তীর্থের সম্পূর্ণ ভার দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছেন। 'বাঘ' মধ্যভারতের তথা সমগ্র ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পমন্দির। যেখানে দেশী বিদেশী বহু শিল্পরসিক গমনাগমন করে থাকেন সেখানে এই রেস্ট হাউসটিতে না আছে রাত্রিবাসের যথাযোগ্য ব্যবস্থা, না আছে ক্ষুধা নিবারণের সামান্যতম উপকরণ। কোন নিরাপত্তার প্রশ্ন তোলা অবান্তর।

বেলা দশটা নাগাদ উঠলাম 'বাঘ' গুহায়।

'বাঘ' গুহা নামটা বোধহয় কাছাকাছি গ্রাম বাঘ-এর নাম অনুসারে। অথবা গুহার নীচে 'বাঘিনী' নামে যে নদীটা ধীরগতিতে বেয়ে চলেছে তার থেকে। বিন্ধ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে যে ছোট পাহাড়ের সারি চলেছে তার একটার খাড়া বুকে নির্মিত হয়েছে 'বাঘ' গুহা—ভারতীয় শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ। এখনো পর্যন্ত নয়টা গুহার সন্ধান পাওয়া গেছে। সংখ্যায় অজন্তা গুহার অনেক ছোট হলেও—ভাস্কর্য এবং ভিত্তি চিত্রের

শিল্পগুণে 'বাঘ' গুহার স্থান 'অজন্তা'র মতই বিশিষ্ট। উজ্জয়িনী থেকে 'বাঘে'র পথে যাকেই প্রশ্ন করেছি 'বাঘ' গুহা সম্বন্ধে—সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর পেয়েছি, পঞ্চপাণ্ডব সংক্রান্ত নানা মজার মজার উক্তিপূর্ণ মহাভারতের গল্পে। এমন কি একদিন এখানে স্থানীয় কয়েকজন ছাত্র এবং শিক্ষিত দর্শকদের সাক্ষাৎ পেলাম। তারাও দেখি—বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে চেনবার চেষ্টা করছে—কোনটা যুধিষ্ঠির, ভীম বা অর্জুন। যদিও ঠিক বাইরেই বেশ বড় হরফে গুহার ইতিহাস লিখে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে। বিশেষ করে এটা যে পাণ্ডব-গুহা নয় সে কথাটা বেশ স্পষ্ট করেই লেখা আছে। 'অজন্তা'তেও একই ব্যাপার দেখেছি। স্থানীয় লোকরা ভক্তিভরে বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব ইত্যাদিকে রাম লক্ষ্মণ এবং রামায়ণের বিভিন্ন চরিত্র জ্ঞানে প্রণাম করতো।

ওইখানে একদিন সকালে যখন ২নং গুহায় বসে বসে মূর্তির অনুলিপি করছি হঠাৎ কানে এলো বিদেশী কথাবার্তা। পেছনে তাকিয়ে দেখি একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক সঙ্গে দুটী যুবক ও যুবতী। তিন জনই পশ্চিম দেশীয়। বৃদ্ধ পাশে বসলেন এবং ঘনিষ্ঠ হয়ে জানতে চাইলেন যে, আমি শান্তিনিকেতনের ছাত্র কিনা। উত্তরে জানালাম, বাংলা থেকে এলেও দুর্ভাগ্যবশতঃ শান্তিনিকেতনের ছাত্র নই আমি। আলোচনায় জানলাম—ইনি জগৎবিখ্যাত প্রাচ্য কলাবিদ্ ইতালীয় পণ্ডিত অধ্যাপক তুচ্চি। সম্প্রতি ইনি তাঁর নেপাল ভ্রমণ শেষ করে বোম্বাইয়ের পথে 'বাঘ', 'অজন্তা' প্রভৃতি শিল্প-তীর্থগুলি আবারও দেখে যাচ্ছেন। ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে তাঁর অদম্য উৎসাহ। রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, গুরুদেব ভোলা চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে নানা ঘনিষ্ঠ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমাকে খুব অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। ওঁর সঙ্গী হয়ে গুহার প্রত্যেকটী ভিত্তিচিত্র এবং ভাস্কর্য্য দেখবার সুযোগ পেলাম। অসামান্য পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ঐতিহাসিক এবং সমসাময়িক অন্যান্য গুহার শিল্পকর্মের তুলনামূলক

বিচার করে অত্যন্ত অল্প সময়ে অতি সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করে আমার ব্যক্তিগত বিচারের সাহায্য করলেন।

যদিও 'বাঘ' গুহা নির্মাণের ঠিক সময় এখনও জানা যায়নি, তবু ছবি ও মূর্তি'র ঢং দেখে পাশ্চাত্য মনীষীরা অনুমান করেন খুব সম্ভব এগুলি পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দের, ফলে এগুলির নির্মাণ কাল 'অজন্তা'র ১৬ ও ১৭নং ইত্যাদি গুহার সমসাময়িক। কিছুদিন আগে ২নং গুহার সামনে ভাঙ্গা পাথরের স্তূপ পরিষ্কার করার সময় যে তাম্র শাসন পাওয়া গেছে তার অনুসরণে অনুমান করা হয়েছে ৪র্থ শতকে কোন সময়ের। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু, শ্রীঅসিতকুমার হালদার ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয় ১৯২১ সালে বাঘ চিত্র অনুলিপি করার সময়ে ছবির দুই জায়গায় লাল রঙে আঁকা প্রাচীন লিপির ভগ্নাবশেষ দেখেছিলেন। এবং একটির অনুলিপি স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে দিয়ে পাঠোদ্ধার করিয়ে যা অনুমান করেছেন তা হ'ল অষ্টম বা নবম শতকে হরিদেব নামক কোন উপাসক বা শিল্পী চিত্রগুলি এঁকেছেন বা চিত্রকর দিয়ে আঁকিয়ে পুণ্য সঞ্চয় করেছেন।

এখানকার গুহাগুলির বিশেষত্ব হলো, এগুলির কয়েকটী একাধারে বিহার এবং চৈত্য। স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যে 'অজন্তা' গুহার সঙ্গে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। 'বাঘে'র ২নং, ৩নং এবং ৪নং গুহার সঙ্গে 'অজন্তা'র ৪নং এবং ১২নং-এর গঠনে বেশ খানিকটা মিল আছে। গুহাগুলির সামনের বারান্দা যা একদিন অপূর্ব চিত্র ও মূর্তি'তে অলংকৃত ছিল তা প্রায় সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়েছে। শুধু উপরে ঝুলে থাকা ছাদের অংশ, নীচের থামের ধ্বংসাবশেষ, দেয়ালে ক্ষয়প্রাপ্ত চিত্রের ও মূর্তি'র টুকরো টাকরা দেখে আর সামনের বিস্তীর্ণ বিন্ধ্যের ও বাঘিনীর পশ্চাদপটের দিকে তাকিয়ে যতটুকু কল্পনা করা যায়—তাই রোমাঞ্চকর।

২নং, ৪নং ইত্যাদি গুহাগুলি সাধারণত ১৫০ × ৯৪ ফুট করে লম্বা ও চওড়া। ৫ × ১৬ ফুট মাপের মোটা মোটা থামবিশিষ্ট হলঘরগুলির গঠন

প্রণালী দেখবার মত। পাশে পাশে ২০ বা ২৫টি করে ভিক্ষুকদের ছোট ছোট আবাস গৃহ চওড়ায় ৯ ফুট এবং লম্বায় ১০ ফুট। একমাত্র ৪নং গুহাটিতে ২৮টি কক্ষ দেখা যায়।

এর পরে প্রথমে উপগৃহ (এটি কম) এবং শেষে স্তূপ গৃহ। বাকিগুলিও মোটামুটি একই রকম। কেবল স্তূপ গৃহ ছাড়া। কারণ সেগুলি বিহার। থামগুলি মোটা এবং নীচে থেকে উপর পর্যন্ত নানা ঢঙে খোদাই করা। আবার কোন কোন থাম সাপের মত পেচিয়ে সম্পূর্ণই অপূর্ব দক্ষতায় খোদাই করে অলংকৃত।

গুহার ভেতরে ঢুকেই স্তম্ভিত হতে হয় তার গভীর গম্ভীর পারিপার্শ্বিকতায়। চতুর্দিকে মোটা মোটা থাম। তাতে সুন্দর ও সরল অলংকরণ। সামনের দিকের আলোর স্পষ্টতা ক্রমেই পেছনের আলোর অস্পষ্টতা হয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। ২নং গুহার ভিত্তিচিত্র গুলি কালের এবং মানুষের অত্যাচারে প্রায় সম্পূর্ণ মুছে গেছে। শুনলাম গুহাগুলি পুনরুদ্ধারের আগে স্থানীয় সাধু সন্ন্যাসীদের আবাস গৃহ হয়ে উঠেছিল। তাদের ধুনির এবং উনুনের ধোঁয়ায় চারিদিকের দেয়ালগুলি কালো হয়ে গেছে। তা থেকে কিছু উদ্ধার করা অসম্ভব। শুধু প্রবেশ দ্বারের কাছে আর উপরের ছাদের কিছু কিছু চিত্র তাদের পূর্ব গৌরবকে বাঁচিয়ে রাখবার ব্যর্থ চেষ্টায় যাই যাই করেও মুছে যায়নি। ভিক্ষুকদের ছোট ছোট থাকবার ঘরগুলি একেবারেই অন্ধকার। শোবার জন্য আছে ছোট প্রস্তর বেদী এবং পাশেই দেখা যায় দীপাধার। গভীর অন্ধকারের মধ্যে পেট্রোমাক্স-এর আলোয় এসে উপস্থিত হলাম উপগৃহে। এই উপগৃহের মধ্যেই স্তূপগৃহের প্রবেশদ্বার। এবং দ্বারের দু' পাশে দু'টি বোধিসত্ত্ব মূর্তি—প্রায় আট ফুট লম্বা। বামদিকের মূর্তিটি দক্ষিণের তুলনায় বেশী অলংকৃত। মাথায় জটা মুকুট আর তার মধ্যে অভয়মুদ্রা যুক্ত ক্ষুদ্র বুদ্ধ মূর্তি শোভিত। শূন্য দেহ, পরনে ধুতি আপাদ প্রসারিত।

দুই পাশের দেয়ালে প্রায় একই ঢঙের বুদ্ধ এবং অবলোকিতেশ্বর ও মৈত্রেয়র এক একটি দল। মধ্যে বুদ্ধ মূর্তি প্রায় ১০½ ফুট লম্বা আর দু'পাশে দু'টি বোধিসত্ত্ব মূর্তি অপেক্ষাকৃত ছোট। ডানদিকের মূর্তিটি খুবই অক্ষত আছে। মধ্যের বুদ্ধ মূর্তি পদ্মের উপরে দাঁড়ানো। ডান হাতটি বরদামুদ্রা আর বাঁ হাতটি কাপড় ধরা। বোধিসত্ত্বের ডান হাতে চামর। বাঁ হাতে কাপড়ের বন্ধনী ধরা। ঢঙটির সঙ্গে কুষাণ ও গুপ্ত যুগের মূর্তির বেশ খানিকটা মিল আছে। 'অজন্তা'র মত এখানেও কয়েকটি 'নাগ' ও 'যক্ষ' মূর্তি আছে। তবে সেগুলি গুহার বাইরে বিধ্বস্ত বারান্দার অংশে থাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে এমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে তা থেকে কিছু খুঁজে বার করা মুশকিল। 'বাঘে'র ভাস্কর্যগুলির মধ্যে আর একটি জিনিস দেখা গেল। মূর্তিগুলির উপরে সম্ভবত কোন বিশেষ ধরণের আস্তরণ দেওয়া ছিল যার উপর হয়তো নানা রঙে চিত্রিতও করা ছিল। কিন্তু সে আস্তরণ বিলুপ্ত হয়ে গেলেও কিছু কিছু চিহ্ন এখনো খুঁজে পাওয়া যায়। এই ধরণের চিত্রিত বুদ্ধ মূর্তির ছবি চীনের তুন-হুয়াং গুহার ছবির মধ্যে দেখেছি। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সম্পর্কে আমার বক্তব্য শেষ করার আগে আর একটি বিশেষ ধরণের অলংকরণের কথা বলবো যা আমাকে অত্যন্ত মুগ্ধ করেছে। 'বাঘে'র বিরাট বিরাট থামগুলির সঙ্গে যে ব্রাকেট ব্যবহার করা হয়েছে তার কয়েকটিতে আছে একটি বিশেষ ধরণের খোদিত সিংহ মূর্তি। সিংহের এমন সরল অথচ রাজকীয় বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গী খুবই কচিৎ চোখে পড়ে।

'বাঘে'র স্থাপত্য ও ভাস্কর্যকে বৈশিষ্ট্যে হারিয়েছে তার অপূর্ব ভিত্তি চিত্রগুলি। যদিও তার বেশীর ভাগই মানুষের চোখের সামনে থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং যেতে চলেছে। গুহাগুলি পুনরাবিষ্কারের পর থেকে অল্প কিছুদিন আগে পর্যন্ত অজ্ঞ জনসাধারণ ধ্বংসাবশিষ্ট অস্পষ্ট ভিত্তিচিত্র গুলিকে স্পষ্ট করে দেখবার জন্য জলে ভিজিয়ে

নিত। যার ফলে আজ এই অমূল্য শিল্প নিদর্শন সম্পূর্ণ বিলীন হতে চলেছে।

২নং গুহার ছাদে যে চিত্রগুলির অংশ দেখা যায়, মূলত অলংকরণই এর উদ্দেশ্য। তবে অলংকরণের সঙ্গেই আছে বিভিন্ন পত্রপুষ্প ও পশুপক্ষীর প্রতিচ্ছবি। ৪নং গুহার ছাদের চিত্রের সঙ্গেও এর ঘনিষ্ট মিল আছে। এই গুহার কোন দেয়ালের চিত্রই আজ আর দৃশ্যমান নয়।

৪নং গুহার বারান্দায় যে চিত্রগুলির একটি মালা আবছা আবছা দেখা যায়, মূলত ঐগুলিই 'বাঘে'র বিশেষত্ব। 'অজন্তা' এবং 'বাঘে'র চিত্রগুলি শিল্পদক্ষতার বিচারে সমপর্যায়ভুক্ত। দুই গুহারই চিত্রগুলি এক স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ এবং দক্ষ তুলির টানে জীবন্ত। কিন্তু 'বাঘ' এবং 'অজন্তা'র মূল প্রভেদ দু'টি; প্রথম, তাদের বিষয়বস্তু নির্বাচনে। 'অজন্তা'র চিত্র বেশির ভাগই ধর্মমূলক। জাতক এবং বৌদ্ধ জীবনী ধরেই তার বিন্যাস। 'বাঘ' কিন্তু মানবীয় আবেগে মূর্তিমান। সমসাময়িক মানুষের দুঃখ, আনন্দ, জীবন ও ধর্মের অভূতপূর্ব সম্মিলন ঘটেছে এই অসাধারণ চিত্রগুলিতে।

দ্বিতীয়ত, 'অজন্তা'র ছবি দেখে প্রথমেই মনে হয় বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন শিল্পীর দ্বারা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সেগুলি কল্পিত ও অঙ্কিত হয়েছে। কিন্তু 'বাঘ' দেখে অনুমান করা যায় একই সময়ে এক বা একাধিক—একই গোষ্ঠীভুক্ত শিল্পীর ঐক্যবদ্ধ চিন্তায় 'বাঘ' রূপায়িত হয়েছে। বিভিন্ন চিত্রীর ব্যক্তিগত বৈচিত্র্যের বদলে অনিন্দ্য ভাবে ধরা দিয়েছে এক সমষ্টিগত সাবলীল চিত্র শৈলী—যা প্রতি রেখায়, প্রতি ঢঙে, প্রতি রঙে অসামান্য প্রতিভার সাক্ষর রেখে গেছে।

৪নং গুহার বারান্দায় ভিত্তি চিত্রের অবশিষ্টাংশের প্রথম চিত্রটি অত্যন্ত মানবীয়। দুটি নারীমূর্তি মুক্ত কক্ষে উপবেশিতা। তার মধ্যে দ্বিতীয়া শোকে মুহ্যমানা। প্রথমা সেই শোকে সমব্যথিতা ও চিন্তাগ্রস্থা হয়ে

দ্বিতীয়ার শোককাহিনী শুনছে। শোকের এমন অপূর্ব জীবন্ত মূর্তি চিত্রজগতে দুর্লভ।

এই চিত্রমালার চতুর্থ চিত্রে ফুটে উঠেছে আনন্দের এক বাস্তব রূপ। দুইদল বাদ্যকারিণী এবং দুজন নর্তকী 'ঘন' বা মন্দিরা, কাঠি, এবং 'অবনদ্ধ' প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে আনন্দে বিভোর। চিত্রটির মূর্তি সংস্থাপন 'অজন্তার' মত। ঘেষাঘেঁসি ভাবে অনেক জিনিষের একত্র সমাবেশ হলেও চক্রাকারে সাজানোর ফলে এবং নর্তকীদের মাথা একে অপরের বিপরীত দিকে হেলে পড়ায় তাদের ছন্দোময় নৃত্য হিন্দোল অনবদ্য ভাবে রূপায়িত হয়েছে।

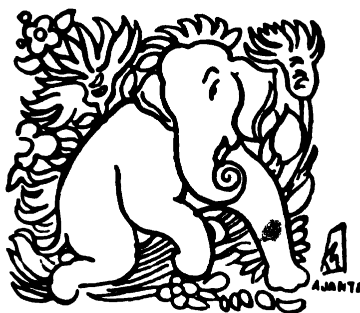
এই সারির শেষ চিত্র একটি হাতির মিছিল। 'অজন্তা'র মতই এই চিত্র অন্য চিত্র থেকে পৃথক করা হয়েছে মাঝখানে একটি সুদৃশ্য ফটক এঁকে। এই চিত্রের পরিপ্রেক্ষিত—চিত্রণ অত্যন্ত বাস্তবতায় রূপায়িত হয়েছে। নানা শিল্পী ও শিল্পরসিকদের মুখে শোনার ফলে আমার বদ্ধমূল ধারণা ছিল ভারতীয় চিত্রের পরিপ্রেক্ষিত—চিত্রণ বাস্তব নয়। ভারতীয় শিল্প শাস্ত্রের তাল, মান, প্রমাণ ইত্যাদি সম্বন্ধে অজ্ঞানতাই এর কারণ। এতদিনের শিল্প সাধনায় পরিপ্রেক্ষিত—চিত্রণ সম্বন্ধে আমার যতটুকু জ্ঞান হয়েছে তাতে এর চেয়েও বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত—চিত্রণ আমার কল্পনাতীত।

৪নং গুহার ভেতরের দেয়ালে এবং ছাদে কিছু চিত্র এখনো অক্ষত রয়েছে। তার মধ্যে কমললতা ঢঙের সঙ্গে অজস্র হংস বলাকার প্রাণবন্ত চিত্র আছে। প্রতিটি রেখা এবং চিত্রসংস্থাপনে ছবিগুলি অতুলনীয়। ৪নং গুহার পেছনে স্তূপগৃহের সামনা সামনি স্তম্ভের উপর কয়েকটি অলংকরণ আছে। তার মধ্যে কয়েকটিতে যে মৃণাল ও মৃণালিনী বাস্তব ঢঙে চিত্রিত করা হয়েছে তা সত্যই অবর্ণনীয়।

এই গুহাটির স্থানীয় নাম রঙমহল। ১৭৪ × ১৫০ ফুট মাপের

এই গৃহে ঢুকে ছাদ থেকে দেয়াল পর্যন্ত চোখ বুলালে এমন কোন শিল্পরসিক নেই যিনি সম্পূর্ণ অভিভূত না হয়ে পারবেন। অনিন্দ্যসুন্দর বর্ণবিন্যাস, চিত্রসংস্থাপনের চাতুর্য এবং বিষয়বস্তু নির্বাচনের বৈশিষ্টতা দেখে মন বিস্ময়ে ভরে যায়,—সেই মহান শিল্পী তিনি একজন কি একই গোষ্ঠী, যার সমকক্ষ সমসাময়িক এবং আধুনিক জগতে বিরল। একথা বিশ্বাস করতে আর অসুবিধা হয় না যে—'বাঘ' ও 'অজন্তা'র এই শিল্প উৎস থেকেই একদিন গোটা পূর্ব এশিয়ার শিল্পধারা জীবনরস আহরণ করেছিল।





"ভারতচিত্র-শিল্পের শেষ দীপাবলী যেখানে আজও বিচিত্রচ্ছটা বিস্তার করিতেছে—বৌদ্ধ-যুগের সেই অজন্তা গিরিগুহায় আর বৈদ্যুতিক আলোকপ্রখর এই নব্য বাঙ্গালায় ব্যবধান বিস্তর—পথের ব্যবধান, কালের ব্যবধান, সভ্যতা ভব্যতা উভয়েরই ব্যবধান; সুতরাং অজন্তার চিত্রশিল্পের সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণ পরিচয় ঘটাইতে হইলে শুধু শুনিয়া নয় সেটা দেখিয়া বোঝাও প্রয়োজন·········ইতিহাস পাঠ করিতে করিতে হয়তো প্রাচীন ভারতের নির্ব্বাপিত-প্রায় সেই প্রদীপের দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়িবে—যে প্রদীপের শিখা স্নিগ্ধ উজ্জ্বল প্রশান্ত এবং যাহার আলোক বিদ্যুতের মত তীব্রও নয়—নয়নের পীড়াও দেয় না।"

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি। উদাত্ত গম্ভীর বুদ্ধ মন্ত্র ধ্বনিত হচ্ছে, পীত বসনাবৃত শত সহস্র বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণী প্রণত হয়ে পড়েছে স্তূপপাদমূলে। পারিপার্শ্বিকতা আমাকে গ্রহণ করেছে। এ সূর্যরশ্মি, মৃদু পবন, এখানের মধুর মৃত্তিকা গন্ধ আমার ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেহে নব প্রাণ সঞ্চারিত করেছে। উত্তর ভারতে হিমালয় পাদদেশে রোহিণী-তীরে রক্ত মৃত্তিকা ভূষণ, সুপরিকল্পিত নগরী কপিলাবস্তুর পথে নিজেকে আমি খুঁজে পেলাম। নগর পরিখা পেরিয়ে বিবিধ অলংকরণ খোদিত কাষ্ঠনির্মিত নগরদ্বারে উৎসবমুখর নাগরিক-নাগরিকাদের সাথে নিজের উপস্থিতিও অনুভব করলাম।

পরিচ্ছন্ন জলসিক্ত রাজপথ, শ্যামল উদ্যানবেষ্টিত দারুময় নাগরিকাবাস। ছায়া সুনিবিড় রাজোদ্যানের বৃক্ষতল, শ্রান্ত পথিকের ক্লান্তি ও ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণের জন্য প্রাসাদ তুল্য 'বাওড়ী' বা ইঁদারার ভূ-গর্ভস্থিত কক্ষ, নাট্যশালা, বিপণিশ্রেণী, বিশাল সম্মিলন কক্ষ, নগর উপকণ্ঠে সুকর্ষিত ভূমি, তারপর সুস্থ, সবল, সুন্দর, স্বাভাবিক, প্রাণোচ্ছল এ নাগরিকেরা যেন পরিশ্রম ও সু-বণ্টন দ্বারা অভাব অনটন পেরিয়ে গেছে। তাই বোধ হয় এখানে এত প্রাণ, এত রং, এত আনন্দ। তাই সম্ভব হয়েছিল সর্বকালের, সর্বলোকের বুদ্ধোত্তম গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব। কলালক্ষ্মী

এখানে বরদারূপে আবির্ভূতা। তাঁর আশীর্বাদে সার্থক হয়েছে শিল্পী অথবা শিল্পীগোষ্ঠীর সমবেত চেষ্টায় সৃজিত এই মহৎসৃষ্টি।

তাই দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার করলাম—

"যথা সুমেরুঃ প্রবরো নগাণাং যথাণ্ডজনাং গরুড়ঃ প্রধানঃ।

যথা নরাণাং প্রবরঃ ক্ষিতীশ স্তথা কলানামিহ চিত্রকল্পঃ॥"

অর্থাৎ পর্বতমালার মধ্যে সুমেরু যেমন শ্রেষ্ঠ, অণ্ডজ প্রাণীর মধ্যে গরুড় যেমন প্রধান—নরগণের মধ্যে রাজা যেমন শ্রেষ্ঠ, কলাসমূহের মধ্যেও চিত্রকল্পও সেইরূপ সর্বশ্রেষ্ঠ।

'অজন্তা'র গুহা মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি বারে বারে বাস্তবকে ভুলে যাচ্ছিলাম। 'বাঘ' গুহা আমাকে অভিভূত করেছিল, 'অজন্তা' চমকিত করেছে। যতবারই মনে পড়েছে, উনত্রিশটি বিভিন্ন গুহার বিরাট এই শিল্প নিদর্শণের খুঁটিনাটি ভাল করে দেখা দূরে থাক, সাধারণ ভাবে দেখতেও অন্তত উনত্রিশ দিন লাগবে, ততবারই চোখের উপর ভেসে উঠেছে আমার পকেটের অসহায়তা। এ দরিদ্র দেশে দরিদ্রতম শিল্পীদের শিল্পচর্চা যে কত হাস্যকর তা যেন আজ আবার নতুন করে উপলব্ধি করলাম। শুধু গুরুদেব ভোলা চট্টোপাধ্যায়-এর আশীর্বাদ ও টেকনিশিয়ান ষ্টুডিয়োর সহকর্মীদের সহানুভূতি সহায় করে এই সব সুদূর ভারতের শিল্পতীর্থগুলি দেখবার জন্য বেরিয়ে পড়েছিলাম, সর্বদাই নানা অসুবিধার বোঝা ঠেলে যেটুকু দেখতে পেরেছি বা যেটুকু বুঝতে পেরেছি তা ভাল করে গুছিয়ে গ্রহণ করা আমার সামর্থের বাইরে। যত সংক্ষেপে যতটা বেশী পারি তাই আয়ত্ব করবার চেষ্টা করেছি।

'অজন্তা' থেকে তিন মাইল দূরে গেস্ট হাউসের নীরব কক্ষে স্থানীয় আর্কিওলজি বিভাগের কয়েকজন কর্মী তখন কলাকার হিসাবে আমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছিলেন, ক্রমে রহস্যময়ী সন্ধ্যার কাব্যময় পরিবেশ গল্পের গতিকে 'অজন্তা' আবিষ্কারের কাহিনীর দিকে নিয়ে এলো।

১৮১৯-২০ সালে মাদ্রাজ সেনাবাহিনী বোম্বাই-হায়দ্রাবাদ সীমান্তের একটি গ্রাম আক্রমণ করে। সৌভাগ্যবশত গ্রামবাসিগণ সেই আক্রমণকে প্রতিহত করে, ফলে আক্রমণকারী মাদ্রাজ সেনাবাহিনী পেছিয়ে এসে তাপ্তীর এক শাখা নদীর কিনারায় অপেক্ষা করতে থাকে। রণক্লান্ত এক ইউরোপীয় তরুণ অফিসার একঘেঁয়েমি কাটাবার জন্য একদিন শিকারে বেরিয়ে গভীর জঙ্গলে ঢোকে। ক্রমে শিকার অনুসরণ করে জঙ্গল পেরিয়ে এদিকের নদীর কিনারে এসে পড়ে, শিকার অনুসারী নজর ওপারের ওই খাড়া পাহাড়ের উপর পড়তেই ১২০০শ বছর অজ্ঞাতবাসের পর আবিষ্কৃত হয় এই জগৎদুর্লভ শিল্প ঐশ্বর্য। তারপর ১৮৪০ সালে আর একজন ইউরোপীয় শিকারী ঐ এলাকাতে শিকারে আসেন এবং স্থানীয় এক রাখাল যুবকের সাহায্য নেন; রাখাল সাহেবকে বাঘের আবাসস্থল এই গুহার মধ্যে এনে হাজির করে। এই ইউরোপীয় ভদ্রলোকই প্রথম যিনি গুহার শিল্পনিদর্শনের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। অবশ্য ১৮৪৩ সালে লেখা জেমস্ ফারগুসনের এই বিষয়ক প্রবন্ধই বোধ হয় প্রথম কার্যকরী আলোড়ন তুলতে সমর্থ হয়। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টররা মাদ্রাজ সেনাবাহিনীর মেজর রবার্ট গিল্‌কে 'অজন্তা' ভিত্তি চিত্রগুলির অনুলিপি করতে নিযুক্ত করেন। কয়েক বছরের চেষ্টায় মেজর গিল্ কিছু ছবির অনুলিপিও করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেগুলি প্রায় সবই ইংলণ্ডে 'ক্রিস্টাল প্যালেসে' ১৮৬৬ সালে আগুনে পুড়ে যায়। তারপর ১৮৭২ সালে প্রিন্সিপ্যাল ডক্টর জন গ্রিফিথ্‌সের পরিচালনায় বোম্বে আর্ট স্কুলের ছাত্ররা দশ বছর ধরে আবার কিছু অনুলিপি করেন, কিন্তু সেগুলি হ্যাভেল সাহেবের মতে অতীব প্রাণহীন। পরে বোধ হয় সবচেয়ে বেশী অনুলিপি করেছেন স্থানীয় শিল্পী সৈয়দ আমেদ। তাঁর কাজও আমার প্রাণহীন মনে হয়েছে।

সাধারণ জগতে 'অজন্তা' বহুদিন অজ্ঞাতবাস করলেও স্থানীয় জনমনে এর মনোহর রূপ, রূপকথার রঙে চিত্রিত ছিল। অনেক অনেক দিন

আগে স্বর্গের দেবকুল, গন্ধর্বকুল, কিন্নরকুল একদিন সন্ধ্যায় নন্দন ছেড়ে বেড়াতে এসেছিলেন মর্ত্যে। তাঁদের এই মর্ত্য ভ্রমণের ছাড়পত্র ছিল ব্রহ্ম-মুহূর্ত পর্যন্ত। কিন্তু তাঁরা বিন্ধ্যের দক্ষিণে সুষমার প্রাণকেন্দ্র অর্ধচন্দ্রাকৃত ইন্দ্যাদ্রির দেব দুর্লভ মাদকতায় এমনি বিভোর হয়ে গিয়েছিলেন যে—ব্রহ্মমুহূর্তের কুক্কুট ধ্বনিও তাঁদের সজাগ করতে পারেনি। ফলে শাপগ্রস্ত দেবগণ, কিন্নরগণ ও গন্ধর্বগণ তাঁদেরই লীলা প্রস্তুত এই গিরি গৃহে স্ব স্ব অবস্থায় মুহূর্তে চিত্র ও ভাস্কর্যভূত হয়ে গেলেন। আজও তাঁরা এখানে বন্দী—কেউ বা ছবি—কেউ বা মূর্তি রূপে। আজও না কি বসন্তের চন্দ্রমা উজ্জ্বল রাত্রে বন্দী দেবকুলের মুক্তিহীন আত্মার আর্তনাদ 'অজন্তা'র গিরি কন্দর প্রতিধ্বনিত করে তোলে।

আবার যখন আচার্য নন্দলাল ও অসিতকুমার 'অজন্তা'য় গিয়েছিলেন তখন তাঁরা গল্প শুনেছিলেন—কোন স্মরণাতীতকালে বিদর্ভের ইন্দ্যাদ্রির নির্জনে শ্রী বিষ্ণু এই গুহাশ্রেণী নির্মাণের দায়িত্ব বিশ্বকর্মার উপর প্রদান করেন এবং এক রাত্রেই গুহাগুলি সম্পূর্ণ হ'লে, গভীর রজনীযোগে সেগুলি স্বর্গে নিয়ে যাবার ভার গরুড়-এর উপর দেন। বিশ্বকর্মা রজনীর প্রথম যামে কাজ শুরু করলেও সৃষ্টির আনন্দে এমন বিভোর হয়ে যান যে, প্রভাত সূর্যের ক্ষীণ রক্তাভা আকাশ প্রান্তে দেখা গেলেও তিনি সময় সম্বন্ধে সজাগ হন না। বিষ্ণুবাহন গরুড় অতি দ্রুত গিরিপ্রাসাদগুলিকে স্বর্গে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন কিন্তু কুক্কুট ধ্বনি প্রভাতের আগমনী ঘোষণা করায় অগত্যা পক্ষীরাজ গুহাগুলি যথাস্থানে পরিত্যাগ করে অন্তর্হিত হলেন।

'বাঘ' বা 'অজন্তা'তে যে সব ছবির মুদ্রিত অনুলিপি আছে গাইডদের কাছে এইসব অনুলিপিকারদের নাম জানতে চাইলে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই এক জনের নামই জানা যায় তিনি শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু। এই গৌরবাত্মক অজ্ঞতার ফলে বহু জানা অজানা শিল্পীর ভুলত্রুটির দায়িত্ব শিল্পাচার্যের উপরেই বর্তায়। লেডি হ্যারিংহামের অনুরোধে ১৯০৯—১১ সালে

নন্দবাবু ও তাঁর কয়েকজন সহকর্মী 'অজন্তা'র ভিত্তিচিত্রের অনুলিপি করেন। পরে নন্দবাবুর আঁকা যে কয়টি মুদ্রিত অনুলিপি আমার দেখার সৌভাগ্য হয়েছে তাতে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছে যে, তাঁর পক্ষেই কিছুটা সম্ভব 'অজন্তা' ও 'বাঘে'র মহাশিল্পীদের অনুসরণ করা।

প্রাচীন ভারতে এই অংশের নাম ছিল বিদর্ভ। প্রায় খ্রীঃ পূর্ব ২৫০০ বৎসর আগে যাদব রাজা বিদর্ভ এখানে রাজত্ব করতেন। আর্যাবর্ত থেকে দাক্ষিণাত্য যাবার এক প্রাচীন পথের ধারে 'অজন্তা'র অবস্থিতি। বৈদিক সভ্যতা হয়তো একদিন এই পথ ধরেই দাক্ষিণাত্য অভিযানে বেরিয়েছিল, আবার বৌদ্ধ সভ্যতাও একদিন এই পথেই দক্ষিণে পৌঁছেছিল। তারপর চতুর্থ খৃষ্টাব্দে চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন এবং ৭ম খৃষ্টাব্দে হিউ-এন-চাঙ্ এই পথেই 'অজন্তা' পৌঁছেছিলেন।

হিউ-এন-চাঙ্ তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে 'অজন্তা' সম্বন্ধে লিখেছেন—"মহারাষ্ট্র দেশের পূর্ব সীমান্তে অর্ধচন্দ্রাকার এক নদীপ্রবাহ হরিৎবর্ণ পাহাড়ী উপত্যকা পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে। এই ক্ষীণা, মদানীরা পাহাড়ী নদীটির বাম তটে পর্বতের গায়ে সঙ্ঘারামগুলি খোদিত আছে। সুন্দর গুহাশ্রেণী বহুতল উচ্চ মন্দির গৃহ এবং সভাগৃহ সমন্বয়ে সঙ্ঘটি গঠিত হয়েছে। এই সঙ্ঘারাম পশ্চিম ভারতের অধিবাসী অর্হৎ 'আচারা' প্রস্তুত করেন। বিহারের চারিদিকে পাথরের দেয়ালে বোধিসত্ত্বের জীবনের নানা ঘটনা অঙ্কিত আছে। এই চিত্রগুলি অতি চমৎকার ও নিখুঁৎ।"

এই সময় সম্ভবতঃ 'অজন্তা' গুহা শ্রেণীর নাম ছিল 'অচিন্ত্য' মহাবিহার। হয়তো এর থেকেই এর বর্তমান নাম ধারণ করেছে। অথবা কাছেই অজন্তা গ্রামের প্রভাবে কিংবা বৃটিশ গভর্ণর জেনারেলের এজেন্টের বাস এক সময়ে এর কাছাকাছিই ছিল, তার ফলে এজেন্ট থেকে অজাণ্টা বা 'অজন্তা' হয়েছে।

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় মাঝামাঝি পশ্চিম ঘেঁষা সমতল যেখানে পাহাড় রূপ ধারণ করে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়েছে প্রায় ৩০০ ফুট নীচে খান্দেশের কৃষ্ণকালো তুলোচষা মাটির বুক চেরা আঁক-বাঁকা তাপ্তীর শাখানদের উপর, খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের কোন এক সুন্দর প্রভাতে হয়তো কোন ভিক্ষুসম্প্রদায় দাক্ষিণাত্যাভিমুখে চলতে চলতে এখানে খানিক বিশ্রাম নিতে বসেছিলেন, তাপ্তীর এই শাখা নদী, অর্ধচন্দ্রাকৃতি এই মনোরম উপত্যকা, শান্ত সমাহিত এ প্রকৃতি তাদের উৎসাহিত করেছিল ধ্যানোপযোগী জ্ঞান অর্জন ও বিতরণের কেন্দ্র স্থাপন চিন্তায়। তারপর পরিকল্পনা তৈরী হ'ল ; চৈত্য, বিহারের স্থান নির্ণয় হল, স্তম্ভ, গবাক্ষের স্থান ও সংখ্যা নিরূপিত হল, ক্রমে হাতুড়ি ছেনীর ঘা পড়ল, আদিম অগ্ন্যুৎপাতে নির্মিত কঠিন পাথর তার স্বরূপ বদলে সুরূপ ধারণ করল। হাজার হাজার স্থপতি ও শিল্পী প্রায় হাজার বছর ধরে সৃজন করে চলল ভারতের তথা জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম, এসে থামলো অসমাপ্ত ঊনত্রিশ নম্বর গুহায়। পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রায় ¾ মাইল জোড়া এই মহান কীর্তি মানব ইতিহাসে একান্ত দুর্লভ।

অর্ধচন্দ্রাকৃতি পাহাড়ের গায়ে এখনকার মজা নদীর প্রায় দুশো ফুট উঁচুতে একটির পর একটি গুহা খনন করা হয়েছে। খৃষ্ট পূর্ব তৃতীয় শতক থেকে ৭ম খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে ওইগুলি তৈরী।

কোটি কোটি মণ পাথর কাটা এই দানবীয় কীর্তি কি করে সম্ভব হলো তা বুঝতে পারিনি, কি করেই বা সম্ভব হলো এই বিরাট পাথরের স্তূপকে স্থানান্তরিত করা তাও ভেবে অবাক হলাম। গল্প শুনলাম যাঁরা এই কাজ করেছিলেন সেই সব মহান শিল্পসাধকেরা তাঁদের দুরূহ কাজকে সহজ করার জন্য এক বিপরীত পথ বেছে নিয়েছিলেন, প্রচলিত ধারা অনুযায়ী নীচ থেকে শুরু করে ঊর্ধমুখী গঠনরীতি ব্যবহার না করে তাঁরা কাজ শুরু করেছিলেন উপর থেকে, এবং দৈনন্দিন কাজের সুবিধার্থে স্বতস্ফূর্তভাবে যে

যার পরবর্তী কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার রাখতেন, ফলে যখন ক্রমে তারা নীচের কাজে পৌঁছলেন তখন উপরের মূর্তি গঠন ও ভিত্তিচিত্র আঁকানো শেষ হয়েই গেছে, সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার হয়ে গেছে ওই ছেদিত পাথরের স্তূপ। এই উপায় অবলম্বন করে তাঁরা আর একটা অসুবিধার হাত থেকে রেহাই পেয়েছেন, তারা বেঁধে কষ্টকর ভঙ্গিতে খোদাই বা আঁকার ফলে অসুবিধাজনিত আড়ষ্টতাকে জয় করে স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল শিল্পকর্ম করতে পেরেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সাশ্রয় করেছেন বিরাট জনশক্তি, তা ছাড়া "বুলডোজার" বা "ডিনামাইট" বিহীন সে যুগে এই অসম্ভব কীর্তি কল্পনার অতীত।

যদিও পূর্ব-পশ্চিমে অর্ধচন্দ্রাকারে খনন করার ফলে দিনের কোন না কোন সময় সূর্যালোক গুহাগুলির সুপ্তি ভাঙায়, তবুও সামনের দিকের দু' একটা দরজা জানালা দিয়ে যেটুকু আলো ভেতরে পড়ে তা দ্বারা চিত্র ও ভাস্কর্যগুলির আভাস কোনক্রমে বোঝা গেলেও তার বেশী অনুভব করা একেবারে অসম্ভব, বিশেষ করে পিছনের দিকে যেখানে আধো-অন্ধকার পাকা বাসিন্দা। স্থপতি ও শিল্পীরা কি করে এই অন্ধতা ঘুচিয়ে তাঁদের অমর স্বাক্ষর এখানে সৃষ্টি করেছিলেন তা আমার কাছে ধাঁধা হয়ে আছে। মশাল জ্বালিয়ে এখানকার কাজ করা অসম্ভব, তার ধোঁয়া ছবির রং-এর ঔজ্জ্বল্য নষ্ট করবে, তবে হয়তো তৈল প্রদীপ জ্বালিয়ে কাজ করেছেন, অথবা, কিম্বদন্তী আছে যে পালিশ করা ধাতু ফলকের দর্পণে সূর্যরশ্মি প্রক্ষেপণ করে এখানে কাজ করা হয়েছে, কিন্তু পেছনের দিকে এমন সব কোণ আছে যেখানে ঐভাবে আলো নিয়ে যাওয়া খুবই মুস্কিল, সুতরাং ওখানের শিল্পীরা শুধু মহাশিল্পীই ছিলেন না তাঁদের দর্শনও ছিল প্রখর।

মহাশিল্পী বা যথার্থ চিত্রবিদ্-এর স্বরূপ শিল্প শাস্ত্রের মতে—

"শস্যাবিদ্ধং চ বৃদ্ধং চ যঃ করোতি স চিত্রবিৎ॥
তরঙ্গাগ্নিশিখাধূমং বৈজয়ন্ত্যম্বরাদিকং।
বায়ুগত্যা লিখেৎ যস্তু বিজ্ঞেয়ঃ স তু চিত্রবিৎ॥

স্বপ্তঞ্চ চেতনাযুক্তং মৃতং চৈতন্যবর্জিতং।
নিম্নোন্নত-বিভাগঞ্চ যঃ করোতি স চিত্রবিৎ॥"

অর্থাৎ শল্যবিদ্ধ আহত এবং বার্ধক্য যিনি চিত্রিত করতে সক্ষম, তিনি চিত্রবিদ্; সমীরণ সঞ্চারণ, জলতরঙ্গ, প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা, গগনারোহী ধূম বা শূন্যে বিস্তারিত পতাকা—যিনি এই সব গতিভঙ্গী যথাযথ চিত্রায়িত করিতে পারেন তিনিই চিত্রবিদ্। জীবন-চেতনাযুক্ত ঘুমন্ত মানুষ বা চেতনাহীন মৃত্যু; দেহের বিভিন্ন অংশের উন্নতি ও অবনতির রূপ ইত্যাদি—এই সকলের বিভিন্নতা যিনি রূপায়িত করিতে সক্ষম তিনিই যথার্থ চিত্রবিদ্।

তা ছাড়াও তাঁর অথর্ব্ব বেদজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন, ৩২টী শিল্পশাস্ত্রে পূর্ণ জ্ঞান থাকা চাই। এবং বেদমন্ত্র সকল কণ্ঠস্থ থাকা উচিত—কারণ চিত্রাঙ্কনের একাগ্রতার জন্য স্বজনীয় মূর্তির ধ্যান-মন্ত্র গান করতে হবে। শিল্প শাস্ত্র মতে অন্য চিন্তা "চিত্র-দোষ"এর নানা কারণের অন্যতম। যথা—

"দুরাসনং দুরানীতং পিপাসা চান্যচিত্ততা।
এতে চিত্র বিনাশস্য হেতবঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥"

আরও যেমন

"দৌর্বল্যং স্থূলরেখত্বমবিভক্তত্বমেব চ।
বর্ণনাং সঙ্করাশ্চাত্র চিত্র-দোষাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥"

দুর্বলতা, রূপভেদের অভাব অর্থাৎ অবিভক্ততা। অপ্রয়োজনে স্থূল রেখার ব্যবহার এবং বর্ণসাঙ্কর্য ইত্যাদি নানা চিত্রদোষের অন্যতম।

চিত্রবিদ্ যজ্ঞোপবীত, গন্ধপুষ্পমাল্য এবং কুশাঙ্গুরীয় ধারণ করবেন, দেবপূজা পরায়ণ হবেন, ধর্মপত্নীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকবেন এবং অন্য নারীর বিষয়ে নির্লিপ্ত হবেন। সর্ববিদ্যার্জনে সচেষ্ট থাকবেন, সৎ, নির্লোভ, সংযমী, অক্রোধী, ধর্মমতি, দানশীল ও অ-দীর্ঘসূত্রী হবেন।

চিত্রবিদের নির্জনে চিত্রকর্ম করা উচিত, তবে অন্য কোন শিল্পী

অথবা শিল্পরসিকের সামনেও কাজ করতে পারেন, কিন্তু অরসিকের সামনে শিল্পকর্ম করা অসংগত।

সপ্তদশ শতাব্দীর তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারানাথের মতে বৌদ্ধশিল্প সাধারণত তিনভাগে বিভক্ত—দেব, যক্ষ, নাগ। দেব শিল্পশৈলী খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে মগধে প্রচলিত ছিল, এবং তারপর মহারাজ অশোকের সমকালে যক্ষ শিল্পশৈলীর প্রচলন হয়। শেষে তৃতীয় খৃষ্টাব্দে প্রচলিত হয়েছিল নাগ শিল্পশৈলী, যার কিছু নিদর্শন কাশ্মীর ও মাদ্রাজে এখনও পাওয়া যায়। এই বিচারে 'অজন্তা' চিত্রে যক্ষ ও নাগ শৈলী ব্যবহার করা হয়েছে। তবে বৌদ্ধ ধর্মানুযায়ী 'অজন্তা'র স্থাপত্য মূর্তি ও চিত্রণের ঢং অনুসারে মোটামুটি দুটী ধারা অনুমান করা যায়—হীনযান ও মহাযান ধারা। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দের মধ্যে তৈরী চৈত্য ও বিহারগুলিতে হীনযান যুগের অনাড়ম্বর চিত্রণ ও ভাস্কর্য ধারা এবং প্রাচীন কাষ্ঠনির্মিত স্থাপত্য প্রণালীর অনুকরণ ব্যবহার করা হয়েছে। পরবর্তীকালে মহাযান মতের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আড়ম্বর ও জাঁকজমকপূর্ণ ভাস্কর্য ও চিত্রধারার সুন্দর ব্যবহার করা হয়েছে এবং দারু স্থাপত্য অনুকরণ বর্জন এ যুগের বৈশিষ্ট্য।

গুহাগুলিকে সাধারণত এইভাবে ভাগ করা হয়:—

হীনযান যুগ—(খৃষ্টপূর্ব ২০০ থেকে ২০০ খৃষ্টাব্দ)

চৈত্য নম্বর—৯, ১০।

বিহার নম্বর—৮, ১২, ১৩।

মহাযান যুগ—(৪৫০ থেকে ৬৪২ খৃষ্টাব্দ)

চৈত্য নম্বর—১৯, ২৬।

বিহার নম্বর—১ থেকে ৭, ১১, ১৫ থেকে ১৮, ২০ থেকে ২৫; ২৮ ও ২৯।

২৬নং চৈত্যটী বোধ হয় 'অজন্তা'র শ্রেষ্ঠ অলংকৃত চৈত্য। এটী ৬৮ ফুট লম্বা ৩৬ ফুট চওড়া এবং ৩১ ফুট উঁচু। ১২ ফুট লম্বা সুন্দর অলংকৃত

২৬টী স্তম্ভ আছে এতে, তার উপরে চারিদিক ঘিরে পাড়ের মত বন্ধনী। এই পাড়টী নানা অংশে ভাগ করে অলঙ্করণ খোদাই করা হয়েছে, তার উপর অর্ধগোলাকার খিলান ঢং-এর ছাদ, তাতে সমান দূরত্বে কাঠের বরগার মত পাথর খুদে পাষাণ-পাঁজর তৈরী করা হয়েছে। ভিতরের স্তূপটী অপরূপ ভংগিমায় বহু বুদ্ধমূর্তি খোদিত স্বাভাবিক লম্বাটে ঢং-এর, তার উপর মণ্ডপ। এই চৈত্যের একটী বিশেষ ঐশ্বর্য, সম্পূর্ণ অক্ষত একটী ধ্যানগম্ভীর বুদ্ধমূর্তি অর্ধ-নিমিলিত পদ্মপলাশলোচন, তাঁর দক্ষিণ হস্ত বরদা-মুদ্রাযুক্ত। এই চৈত্যের এক শিলালিপি পাঠে জানা গেছে "স্থবির অচল গুরুর জন্য এই শৈলগৃহ নির্মাণ করেন।" দুর্ভাগ্যবশতঃ গুহাটির সামনের দিক প্রায় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত।

'বাঘে'র ৪নং গুহার মত 'অজন্তা'র ১নং বিহারটীও অপরূপ সুষমামণ্ডিত খোদাই ও চিত্রণে পরিপূর্ণ। বোধ হয় এখানে এইটাই মহাযান বৌদ্ধদের শ্রেষ্ঠ শিল্প কীর্তি। বিহারটীর প্রবেশদ্বার থেকে অন্তঃস্থল পর্যন্ত খোদিত মূর্তি, চিত্র ও অলঙ্করণ মনকে সম্পূর্ণ অভিভূত করে ফেলে। রং, রেখা, ভংগি, মণ্ডন, চিত্রষড়ংগ ইত্যাদির যথাযোগ্য ব্যবহার মনকে এক স্বর্গীয় ভাবাবেশে মাতিয়ে দেয়;

'বাঘে'র সঙ্গে 'অজন্তা'র স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যে, ভাস্কর্যে ও চিত্রণে বেশ মিল আছে। এখানকার বিভিন্ন গুহার মূর্তিগুলিও যে একসময়ে যথাযোগ্য রঙে ও রেখায় মণ্ডিত ছিল তার অস্তিত্ব এখনও এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আছে। 'বাঘে'র মত এখানেও হিন্দু ও অনার্যদের বহু দেবদেবী মূর্তি আছে। এখানেও প্রবেশদ্বারের দুই পাশে নিপুণ হস্তখোদিত গঙ্গা-যমুনা মূর্তি। কর্ষণজীবী-পূজ্য মেঘ বৃষ্টির দেবতা সপারিষদ সপ্ত-সর্পশীর্ষ নাগদেব ও ধন-দেবতা যক্ষের মূর্তি এখানে প্রচুর।

হীনযান যুগের বুদ্ধ প্রতীক পদ্ম, হস্তী, শ্রীপদ, জ্যোতিচ্ছটা এবং বোধিবৃক্ষ থেকে মহাযান যুগের পদ্মপাণি ধ্যানীবুদ্ধ, সিংহাসনারূঢ় বুদ্ধ, ধর্মচক্র মুদ্রা, ধ্যানমুদ্রা, ভূমিস্পর্শমুদ্রা, বরদামুদ্রাযুক্ত বুদ্ধ, অবলোকিতেশ্বর,

বোধিসত্ত্ব, মৈত্রেয় ইত্যাদি নানা ভংগিতে নানা ভাবের যে অগণিত বুদ্ধমূর্তি এখানে আমি দেখেছি তার বর্ণনা ভাষাস্তব নয়।

আর্কিওলজি বিভাগ থেকে ভিত্তি চিত্রগুলির রক্ষণাবেক্ষণের চেষ্টা প্রায় ১৯২০ সাল থেকেই চলেছে এবং কিছুদিন আগে প্রফেসর লরেঞ্জো সেসোনি ও কাউন্ট ওরসিনি বলে দু'জন ইটালীয় বিশেষজ্ঞ আনিয়ে এগুলির যথাসাধ্য ধ্বংসোদ্ধার করিয়েছেন। অনেকের মতে এর ফল ভাল হয়নি, অনেক ক্ষেত্রে ছবিগুলি তাদের শিল্পগত পবিত্রতা হারিয়েছে। এই সময়ে ১৯২২ সালে ক্যাপ্টেন উইলিয়ামস্ ১৬নং গুহার ভিত্তি চিত্রের এক অংশ দেয়াল থেকে উঠিয়ে নিয়ে যান এবং সেটি ইংল্যাণ্ডে ১০০০ পাউণ্ড দামে নীলামে বিক্রী করেন। বর্তমানে সেটি বোস্টন মিউজিয়ামে আছে।

২৯টী গুহার মধ্যে ১৬টি গুহায় এখনও ভিত্তি চিত্রের ছিঁটেফোঁটা দেখা যায়, তবে ১, ২, ৯, ১০, ১৬ এবং ১৭ নম্বর মোট এই ছ'টি গুহার ছবিগুলি অপেক্ষাকৃত সুস্থ আছে। যদিও সেগুলি খৃষ্ট পূর্ব তৃতীয় শতক থেকে খৃষ্টাব্দ সপ্তম শতকের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শিল্পীদের দ্বারা আঁকা, তবু তার মধ্যে বেশ একটা সামঞ্জস্য আছে। ডাঃ ইয়াজদানি বলেছেন, "উত্তর শিল্পধারার প্রভাবমুক্ত দাক্ষিণাত্যের শিল্পিবৃন্দ খৃঃ পূঃ প্রথম সহস্রেই স্বকীয় শৈলীতে ছবি আঁকায় বেশ পটু ছিল।" তাঁর ঐ মতের নিদর্শন 'অজন্তা'র ৯নং এবং ১০নং চৈত্যে ব্যবহৃত ঢং দেখলে কিছুটা আন্দাজ করা যায়। 'অজন্তা' ভিত্তি-চিত্র আঁকায় যে সব মাল মশলা ব্যবহার করা হয়েছে, তার বিশদ বিবরণ শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু মহাশয় দেশ পত্রিকায় ১৩৫৯ সালের ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যায় লিখেছেন, তবুও আমি সংক্ষেপে কিছু বলছি। প্রথমত পাথরের দেয়ালের উপর উইমাটি, গোবর, তুঁষ, মেথির জল ইত্যাদির পচানো কাদার বজ্রলেপ অথবা সুরকি এবং আঁশযুক্ত কোন কিছুর বজ্রলেপ-এর আস্তরণ দিয়ে তারপর চুণকাম করে

জমি ভিজে অবস্থায় আঁকা শেষ করতে হতো। চিত্রে যে সব রং ব্যবহার করা হয়েছে, তা প্রায় সবই স্থানীয় পাথর মাটি ও গাছ গাছড়া থেকে সংগ্রহ করা—যেমন, হলুদে মাটি থেকে হলুদে রং, লালমাটি, লাক্ষা বা আলতা এবং পোড়া মাটি থেকে লাল রং, সবুজ পাথর বা তাম্রক্ষার (অক্সাইড অব কপার) থেকে সবুজ রং। তামার বাটিতে টক দই বা ঘোল রেখে তাম্রক্ষার তৈরী এখনো ওদিকের প্রাচীন শিল্পীদের মধ্যে প্রচলিত আছে। অভিজ্ঞ শিল্পরসিকদের মতে, 'অজন্তা'র দেয়াল চিত্রে ফ্রেস্কো এবং টেম্পারা, দুই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে !

কুমারস্বামীর মতে "এসব কাজ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দ্বারা আঁকা হতে পারে, তবে প্রচলিত ধারা অনুসারে স্থায়ী, শিল্পী শিল্পীগোষ্ঠী অথবা চিত্রকর শ্রেণীর সাহায্য নেওয়ার সম্ভাবনাই এক্ষেত্রে বেশী। প্রাচীন ধারানুযায়ী চিত্রাঙ্কণ—উপযুক্ত দেওয়ালকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে নানা ভাবে বিভিন্ন শিল্পীর মধ্যে বণ্টন করে দেওয়ার ফলে বহু শিল্পীর শিল্পকর্মের স্বাক্ষর 'অজন্তা'য় ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে। কল্পনা করা যাক—একদল বিচক্ষণ শিল্পী এখানে কাজ করছে, সহযোগিতা করছে তাঁদের ছাত্রবা। প্রথমেই রং প্রস্তুত করা হয়েছে তারপর যথারীতি জল ও আঠা মিশিয়ে সেই রং নারিকেলের মালায় পর পর সাজিয়ে রাখা হয়েছ। মাটি লেপে চিত্রাঙ্কনের জমিও (পরিকর্ম) প্রস্তুত হয়েছে, এবং তাকে যথারীতি ধবলিত করাও শেষ হয়েছে। শিল্পীরা লেখনী অথবা বর্ণিকা (তুলি) দ্বারা প্রাথমিক আঁকা শেষ করলেন, তারপর দ্বিতীয় আস্তরণ (ওয়াশ) দিলেন। প্রাথমিক রেখাগুলি আবছা হয়ে গেলো, এবার বিভিন্ন রং-এর জন্য বিভিন্ন মাপের বহু বর্ণিকা দ্বারা রং লেপন করে শিল্পী চিত্রকে উন্মেলিত করছেন; এবার মূর্তিগুলির প্রাথমিক কাজ শেষ করে পশ্চাদপটে রং দেওয়া শুরু হলো, তারপর প্রয়োজনীয় রং-এর কাজ শেষ করে বর্তনার (বর্তুলতা) কাজে হাত দিলেন। দুই পাশে ছায়াপাত রং দিয়ে বস্তুকে পশ্চাদপট থেকে মুক্ত করলেন, এবং পুনরায় সীমারেখা

এঁকে চিত্রকর্ম শেষ করলেন।" উঠে যাওয়া ছবি পরীক্ষা করলে লাল রংএ আঁকা প্রাথমিক রেখা এখনো কিছু খুঁজে পাওয়া যায়।

রসোত্তীর্ণ শিল্পগুণে 'অজন্তা' চিত্র সাধারণের চোখেও ভালো লাগে, শিল্পশাস্ত্রের বহু গুণের অধিকারী এ চিত্রগুলি, যথা :—

"রেখাং প্রশংসন্ত্যাচার্য্যা বর্ত্তনাঞ্চ বিচক্ষণাঃ।
স্ত্রিয়ো ভূষণামিচ্ছন্তি বর্ণাঢ্যমিতরেজনাঃ॥"

অর্থাৎ আচার্যরা রেখার অনুরাগী, বিচক্ষণ বর্তনায় মোহিত হন, স্ত্রীগণ ভূষণ-অলংকরণের অনুরাগিণী এবং ইতরজন বর্ণের পক্ষপাতি। তাই এর পরিপূর্ণ রস গ্রহণ করতে হলে ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রে কার্যকরী জ্ঞান থাকা একান্ত দরকার। বর্ণ, বর্তুলতা, অলংকরণ, বস্তু সংস্থাপন ইত্যাদি ভাল লাগলেও চিত্র ষড়ঙ্গ, যথা :—

"রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনম্।
সাদৃশ্যং বর্ণিকা ভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্॥"

রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য, বর্ণিকাভংগ এবং মূল অষ্টরসের যোগ্য পরিবেশন ইত্যাদি বুঝতে পারা সম্ভব হবে না, বিশেষ করে এর পরিপ্রেক্ষিত-চিত্রণ ভাল নাও লাগতে পারে।

প্রাচীন ভারতীয় চিত্রশৈলী পারিপার্শ্বিকতা অনুসরণকারী পরিপ্রেক্ষিত নির্ভরশীল নয়। তার পরিপ্রেক্ষিত ভাবানুসরণকারী, এই পরিপ্রেক্ষিত শিল্পশাস্ত্রের প্রমাণানুগত। প্রমা অর্থে ভ্রমহীন জ্ঞান, দূর বা নৈকট্যের পরিমাণ পার্থক্য বা চক্ষুগত জ্ঞানই প্রমাণ নয়, অনুভবগত আন্তরিক দিকও এর আছে। তাই 'অজন্তা'র পরিপ্রেক্ষিত-চিত্রণ সাধারণগ্রাহ্য নয়।

এখানে ভিত্তিচিত্রে নায়ক-নায়িকা প্রথম নজরে বেমানান লাগবে। বিশেষ করে মহাপুরুষ চরিত্রগুলি পাশ্চাত্য পরিপ্রেক্ষিতানুযায়ী অস্বাভাবিক বড় করে আঁকা বলে মনে হবে, যদি না দর্শকের জানা থাকে ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রানুযায়ী মূর্তি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত, এদের আনুপাতিক মাপও নানা

রকম, যেমন বালামূর্তি—পঞ্চতাল, কুমারমূর্তি—ষটতাল, প্রেতমূর্তি—সপ্ততাল, মানবমূর্তি—অষ্টতাল, যক্ষ, অপ্সরা ইত্যাদি মূর্তি—নবতাল, দেব মূর্তি—দশতাল, ক্রুর-মূর্তি—দ্বাদশতাল, অসুর মূর্তি—ষোড়শতাল ইত্যাদি। মধ্যম অঙ্গুলীর অগ্র থেকে করতলের সীমা পর্যন্তর সাধারণ নাম তাল, শিল্পশাস্ত্রের তাল মানে করোটি থেকে চিবুকের নীচে পর্যন্ত যে দৈর্ঘ্য, তাই বোঝায়। জ্ঞানী পাশ্চাত্য চিত্র সমালোচকদের মতে 'অজন্তা'র পরিপ্রেক্ষিত চিত্রণ স্বাভাবিক। যেমন একসেলজার্ল বলেছেন, "এমন কি মহাপুরুষ চরিত্রগুলিও ভূমিরেখা এবং শীর্ষরেখা অনুযায়ী সুন্দর সুষ্ঠ পরিপ্রেক্ষিতে অঙ্কিত। 'অজন্তা' শিল্পের যে বৈশিষ্ট বিশেষভাবে নজরে পড়লো, তা হচ্ছে এর গতিশীলতা। কি মূর্তি, কি চিত্র, এখানে সবই চলমান, সবই জীবন্ত, দেব-দেবী, মানব-মানবী, পশু-পক্ষী, উদ্ভিদ ও প্রাণী সবই এখানে নড়ে চড়ে। ২০নং গুহার হস্তী মূর্তিটি তার গতিবেগে দেহ সংলগ্ন আসন-ঘন্টিকা ইত্যাদি পশ্চাতে বিক্ষিপ্ত করে ছুটে এগিয়ে চলেছে ; অথবা ১৭নং গুহার বিমানচারী গন্ধর্ব সকল, এ ছাড়া বিভিন্ন গুহার বিভিন্ন মূর্তি, যথা—মৃগ-দম্পতি বা গজ-জাতকের চিত্রাবলী এরা সবাই স্ব স্ব বিশেষ ভংগিতে গতিবান।

মূলতঃ বৌদ্ধ জাতক ও বুদ্ধ জীবনীর ঘটনা নিয়েই 'অজন্তা'র শিল্প বিন্যাস। সর্বজন পরিচিত চিত্র ১৭নং গুহার বুদ্ধ, যশোধারা এবং রাহুল অথবা ১নং গুহার বুদ্ধ ও প্রলোভন বা অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণি ইত্যাদি স্বীয় বৈশিষ্ট্যে পৃথিবীর ভক্তি চিত্রমালার শ্রেষ্ঠতমের অন্যতম। অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণি চিত্রটি খুব সম্ভব, বুদ্ধের সংসার ত্যাগের চিত্র। রাজকুমার সিদ্ধার্থের মহৎ ত্যাগকে আকার দিতে গিয়ে শিল্পী চরিত্রটিকে বিরাটরূপে কল্পনা করেছেন। পাশের অন্য চিত্রগুলি যেন এই মহানের অনুপাতে বেশ ছোট হয়ে পড়েছে। শিল্প ও নাট্যশাস্ত্রে সুপণ্ডিত চিত্র-বিদ্, পূর্ণ শাস্ত্রসম্মতরূপে চিত্রিত করেছেন অবলোকিতেশ্বরকে। দেব চরিত্র চিত্রণ উপযুক্ত অনুলোম পদ্ধতিতে রেখা অর্থাৎ উপর থেকে নীচে রেখা

ব্যবহার করা হয়েছে। সম্ভবতঃ দশ তাল পরিমাণ এর পূর্ণাবয়ব, কুক্কুটাণ্ডাকৃতি এর বদন, ধনুর্বাকৃতির্বা ভ্রুযুগল, পদ্মপলাশলোচন, গজতুণ্ডাকৃতিঃ স্কন্ধ ও করীকরাকৃতিঃ বাহু, গোমুখাকারম্ শরীর ও সিংহকটিতুল্য শরীর মধ্য এবং প্রস্ফুটিত কমলতুল্য পাণিযুগ। প্রতি অংগ দেবভাবে পূর্ণ। ত্রিভংগঠামে স্থির এ মূর্তির দক্ষিণ হস্তে ধরা নীলপদ্ম। জীবনের চরম সিদ্ধান্তক্ষণের যে ভাব শিল্পী তথাগতের মুখে দিতে সক্ষম হয়েছেন, তার বর্ণনা আমার সাধ্যাতীত। বুদ্ধ চরিত্র কথা বলতে গিয়ে শিল্পী সমকালীন বহু চিত্রই এঁকেছেন যা থেকে চক্ষুষ্মান দর্শক খুঁজে পায় সমসাময়িক সভ্যতার নিরিখ। চোখের উপর এবং মনের পটে ধরা দেয় সে যুগের কপিলাবস্তু, রাজগৃহ, গয়া, বারাণসী, শ্রাবস্তি, কুশীনগর, উজ্জয়িনী বিদিশা ও তাদের নাগরিক-নাগরিকারা। মহান এই নাট্যশালায় চলমান হয়ে উঠে চিত্ররূপী জীবন্ত নাটক যার নট-নটী কখন কুমার কখন ঋষি কখন বারাংগনা কখন সতী ; স্বর্গ অথবা নরক।

বীর যোদ্ধাদের অস্ত্রঝংকার বেজে ওঠে, আবার শুনি দেবভোগ্য সংগীত। জীবনের প্রত্যেক অবস্থায় প্রত্যেক পারিপার্শ্বিকতায় চিত্রায়িত হয়েছে নর নারী, গভীর বনানী কখন তাঁদের পশ্চাদপট, কখন সুরম্য উদ্যান। রাজ-প্রাসাদে বা রাজপথে, শ্যামল শস্যপূর্ণ বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে অথবা গগণচুম্বী নগরাজের পদতলে এঁদের অবস্থান। গগনচারী অপ্সরা, গন্ধর্ব, দেব-দেবী, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-অশ্রু এবং হিংসা-দ্বেষ কিছুই শিল্পীর অগোচর নয়। সুষ্ঠ সাবলীল মানব-মানবীর সংগে সংগে একই স্বাচ্ছন্দ্যে শিল্পী এঁকেছেন পশু-পক্ষী, প্রাণী, জলজ বা বনজ, লতা-পুষ্প এবং প্রাণোচ্ছল বন্যতা।

কিছু ইতিহাসও চিত্রিত হয়েছে, যেমন ১নং বিহারের শীর্ষদেশে রাজা দ্বিতীয় পুলকেশীর দরবারে পারস্যের রাজদূত, খৃষ্টাব্দ সপ্তম শতকে পারস্য ও দক্ষিণ ভারতে যে সাংস্কৃতিক আদান প্রদান ঘটেছিল এটি তারই চিত্রায়ন।

সমসাময়িক পারস্যের ইতিহাস থেকে এ ঘটনার নজীর খুঁজে বার করেছেন ডাঃ ইয়াজদানী।

ঐ বিহারের আরেকখানি চিত্র বুদ্ধ ভ্রাতা নন্দর বিরহাতুরা পত্নীর। অশ্বঘোষকৃত কাব্যের নায়িকা নন্দজায়ার এ কাহিনী বৌদ্ধ শিল্পীদের অতি প্রিয় ছিল। স্বামীর প্রবজ্যা গ্রহণের সংবাদে দয়িত-বিরহে মুমূর্ষু নারীর এই শোকচিত্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পে অদ্বিতীয়।

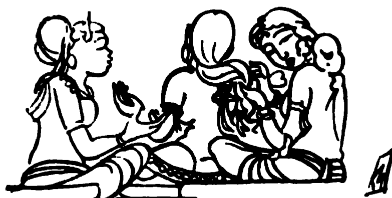
ডাঃ গ্রীফিতের মতে—সমগ্র পৃথিবীর শোকচিত্রের মধ্যে এ ছবিটি অতুলনীয়। তিনি লিখেছেন—

"ফ্লোরেনটাইন শিল্পীদের পক্ষে এর চেয়েও ভাল প্রাথমিক অঙ্কন সম্ভব হতে পারে, ভেনিসিয়ান শিল্পীদের রং এর চেয়েও উজ্জল হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু 'অজন্তা' শিল্পী ছাড়া আর কারও পক্ষে এই অপরূপ ভাব ব্যঞ্জনা কল্পনাতীত।"

'অজন্তা' চিত্রের রসিক দর্শক 'অজন্তা' শিল্পীদের শ্রেষ্ঠ চিত্রবিদ্ বলে মেনে নিতে পারবেন তখনই যখন শিল্প শাস্ত্রের অনুজ্ঞাগুলি 'অজন্তা' চিত্রের উপর ব্যবহারিক প্রয়োগ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে।

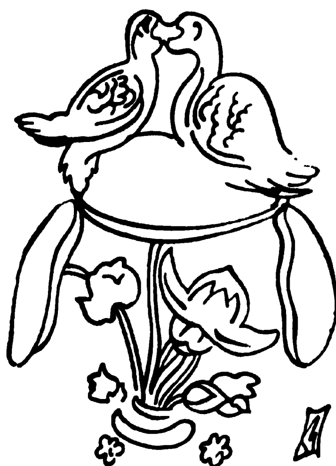
শিল্প শাস্ত্রে শুভ চিত্র-লক্ষণ হচ্ছে শ্বাস-প্রশ্বাসযুক্ত জীবন্ত চিত্র—যা 'অজন্তা' চিত্রের সর্বত্রই প্রতিফলিত। যথা—

"সশ্বাস ইব যচ্চিত্রং তচ্চিত্রং শুভলক্ষণম্।"





বাঘ গুহা শ্রেণী



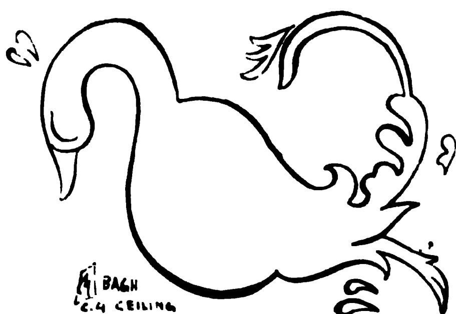
হংস-মিথুন—বাঘ



বোধিসত্ত্ব—বাঘ



বুদ্ধ—বাঘ



বলাকা—বাঘ



শোক ও সান্ত্বনা—বাঘ

নৃত্য ও বাদ্যকারিণী—বাঘ



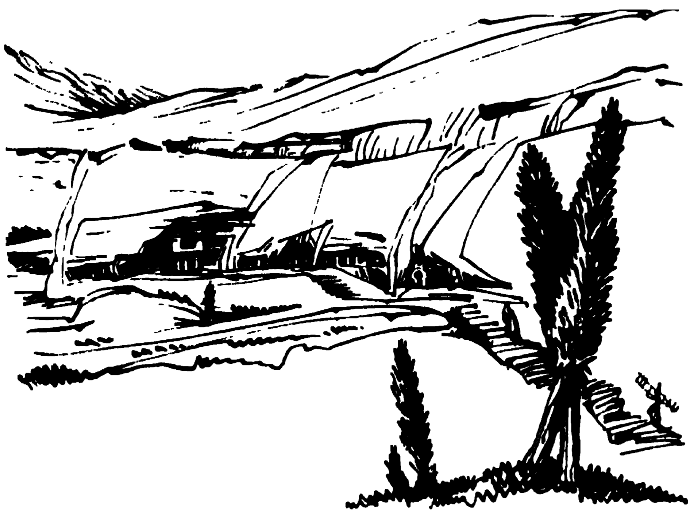
সিংহ মূর্তি—বাঘ



[illegible]—বা



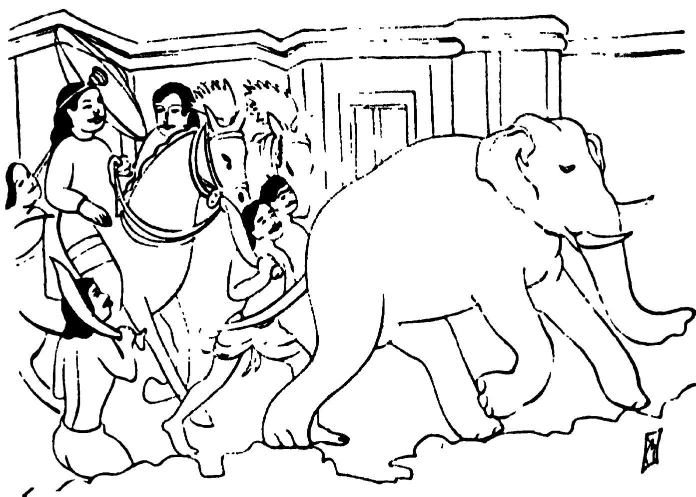
কোমল লতা—বাগ



অজন্তা গুহাবলী



বাদ্যকর—অজন্তা



মহা জনক—অজন্তা



ঢপবাদক -অজন্তা



সঙ্গিনী—অজন্তা



অবলোকিতেশ্বর—অজন্তা



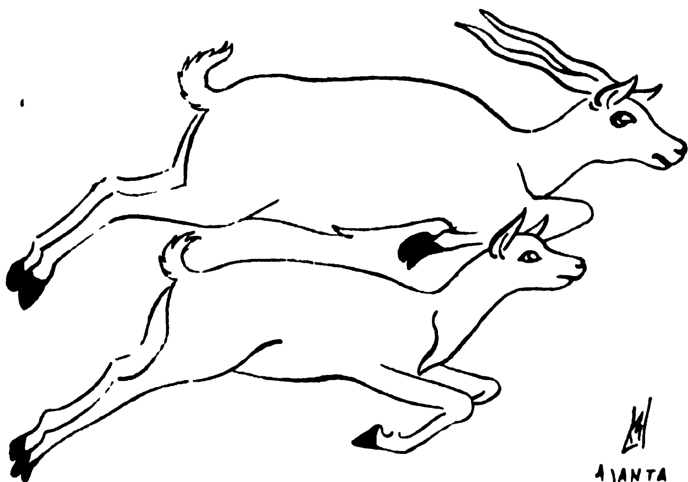
গন্ধর্বকুল—অজন্তা



নাগিনী—অজন্তা



সঙ্গীত পরিক্রমা—অজন্তা



মৃগ দম্পতি—অজন্তা



বংশীবাদিকা—অজন্তা